বিচিত চিন্তা

আহমদ শরীফের ‘ভাষার কথা’ প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে মূল পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

- ভাষা সৃষ্টির ইতিহাস: প্রাচীনকালে মানুষ যখন নিজেদের মনের ভাব দূরের বা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে, তখন পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট কিছু মুখ-নিঃসৃত ধ্বনি সৃষ্টির মাধ্যমে ভাষার জন্ম হয়।
- ধ্বনির অর্থবহতা ও মাতৃভাষা: ধ্বনি নিজে অর্থহীন, মানুষের অভিপ্রায়ই একে অর্থ দান করে। এই অর্থ স্থান বা গোত্রভিত্তিক চুক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় পৃথিবীতে এত ভাষার বৈচিত্র্য। মানুষ জন্ম থেকে যে ভাষার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তা-ই তার মাতৃভাষা। মাতৃভাষা থেকে বিচ্যুত হওয়া মানুষের জন্য অপমৃত্যুর শামিল।
- ভাব ও ভাষার সম্পর্ক: ভাষা হলো মূলত ভাবের বাহন। ভাবই আসল এবং ভাষা এর আনুষঙ্গিক আধার মাত্র। আধারের পরিবর্তনের কারণে ভাবের আকৃতি বদলাতে পারে, কিন্তু প্রকৃতি হারায় না।
- অনুবাদ ও আত্মস্থকরণের গুরুত্ব: কোনো নতুন ভাব বা ধর্মকে নিজের করতে হলে তা মাতৃভাষায় রূপান্তর করা জরুরি। যেমন—ইরানিরা আরবের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও নিজেদের ভাষা ধরে রেখেছিল এবং আরবি শব্দের নিজস্ব অনুবাদ (যেমন: আল্লাহ > খোদা, সালাত > নামাজ) করে নিয়েছিল। একইভাবে বাঙালি মুসলমানের কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে হলে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে তা পরিপাক বা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন।
- বিশ্বজনীন আবেদন: অন্য সংস্কৃতি বা ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং তার ভেতরের বিশ্বজনীন মানবিক মর্মবাণীই (Spirit) অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করে। যেমন—ইউরোপের আচারিক খ্রিষ্টধর্মকে পরিহার করলেও তাদের আস্তিক্য বুদ্ধি ও মানস-খাদ্যকে বিশ্ববাসী গ্রহণ করেছে।
- শব্দের বিবর্তন ও নতুন শব্দ সৃষ্টি: মানুষের চিন্তাভাবনার বিকাশের সাথে সাথে ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি (Style) পরিবর্তিত হয়। নতুন ভাব-চিন্তার প্রকাশ এবং নতুন বস্তু আবিষ্কারের প্রয়োজনে ভাষায় নিজস্ব নতুন শব্দ তৈরি হয় কিংবা অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করা হয়। সৃজন ও ঋণের মাধ্যমেই ভাষা পুষ্টি ও সমৃদ্ধি লাভ করে।
- আত্মপ্রতিষ্ঠার আহ্বান: সবল জাতি সবসময় নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ও আত্মপ্রসার করতে ভালোবাসে। একটি জাগ্রত ও নতুন জাতি হিসেবে বাঙালি মুসলমানদেরও উচিত কোনো প্রকার ভয় বা সংকীর্ণতা কাটিয়ে নির্ভীকতা, উদারতা ও চিন্তাভাবনার প্রবহমানতার মাধ্যমে মানস-জগতে নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মব্যাপ্তি ঘটানো।

আহমদ শরীফের ‘সাহিত্য রূপপ্রতীক’ প্রবন্ধটির মূল বক্তব্যের একটি তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে সহজ ভাষায় পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

- ইসলামের পরিধি ও শব্দের অপপ্রয়োগ: ইসলাম মূলত একটি ভাব, আদর্শ বা জীবন-বিধান (ধর্ম)। এটি বিশ্বাস ও আচরণের সাথে সম্পর্কিত। তাই ভাষা বা সাহিত্যের সাধারণ উপাদানে (যেমন: কমলার বদলে নারঙ্গী বললে ইসলামি হবে—এমন ভাবা) ইসলামি বা বে-ইসলামি ট্যাগ লাগানো এক ধরনের অপপ্রয়োগ ও হাস্যকর যুক্তি।
- ধর্ম বনাম জাতীয় ঐতিহ্য: পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি (যেমন: আরব, ইরানি বা ইউরোপের খ্রিস্টানরা) ধর্ম পরিবর্তন করলেও তাদের স্বদেশের ও স্বজাতির প্রাচীন বা প্রাক-ধর্মীয় ঐতিহ্যকে ভুলে যায়নি। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের একটি বড় অংশ অহেতুক মোহবশে নিজেদের ঐতিহ্য ভুলে আরবের মরুভূমি বা বিদেশের দিকে তাকিয়ে থাকার মানসিকতা দেখায়।
- জাতির উত্থান ও পতনের লক্ষণ:
  উত্থানের লক্ষণ: প্রাণময়তা, আত্মজিজ্ঞাসা, নতুন কিছু সৃষ্টির সাহস এবং নির্ভীকভাবে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো।
  পতনের লক্ষণ: অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তা (পুচ্ছগ্রাহিতা), নিজের ঐতিহ্য ভুলে পরপোষ্য হওয়া এবং অতীতমুখিতা।
- বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তের বহির্মুখিতা: গত হাজার বছরে বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তরা মূলত বহির্মুখী মানসিকতার (বিদেশি সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ মোহ) পরিচয় দিয়েছে, যার ফলে তারা স্থায়ী কোনো মহৎ কীর্তি গড়তে পারেনি। অন্যদিকে নিম্নবিত্তরা মাটির টানে ‘লৌকিক ইসলাম’ বা মরমীয়া তত্ত্বের (যেমন: ভক্তিবাদ, দেহাত্মবাদ) জন্ম দিয়েছে, যেখানে মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে।
- সংস্কৃতি ও মুসলিম সংস্কৃতি: সংস্কৃতি হলো স্বস্থ জীবনবোধ ও সুন্দরের প্রকাশ। কোনো নির্দিষ্ট আদর্শের অন্ধ আনুগত্য থেকে সংস্কৃতি বাঁচে না। আমরা সাধারণত যাকে ‘ইসলামি সংস্কৃতি’ বলি, তা আসলে আরব-ইরান-তুরানের দেশজ সংস্কৃতির একটি পাঁচমিশেলী রূপ; তাই একে ‘ইসলামি সংস্কৃতি’ না বলে ‘মুসলিম সংস্কৃতি’ বলাই যৌক্তিক।
- সাহিত্যে রূপ-প্রতীক ও অলঙ্কারের ব্যবহার: রূপ-প্রতীক বা উপমা ব্যবহার করা হয় বক্তব্যকে সুন্দর ও স্পষ্ট করার জন্য। এটি তখনই কার্যকর হয় যখন তা নিজের মাতৃভাষা ও স্বদেশের পরিচিত পরিবেশ থেকে আসে।

অপরিচিত বিদেশি শব্দ বা প্রতীক সাধারণ মানুষের মনে কোনো গভীর আবেদন তৈরি করতে পারে না।

- **দেশীয় ঐতিহ্যকে বরণের আহ্বান:** দানশীলতার উদাহরণ দিতে গিয়ে বিদেশি 'হাতেমতাই'-এর চেয়ে দেশি 'কর্ণ', কিংবা বীরত্বের ক্ষেত্রে 'রোস্তম-সোহরাব'-এর চেয়ে 'ভীষ্ম-দ্রোণ-অর্জুন' অনেক বেশি পরিচিত ও আপন। সাহিত্য-শিল্পের উৎকর্ষের জন্য বিদেশি উপাদান বা শব্দ গ্রহণের প্রয়োজন থাকলে তা অবশ্যই নেওয়া যাবে, তবে অহেতুক মোহের বশে নিজের দেশের সম্পদকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা আত্মপ্রবঞ্চনার শামিল।

সংক্ষেপে, লেখক বাস্তব পরিবেশ ও যুক্তি-বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিয়ে সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করার এবং আন্তর্জাতিকতার এই যুগে সুস্থ প্রগতির স্বার্থে দেশীয় ঐতিহ্যকে বুকে ধারণ করে উদারভাবে বিশ্বকে বরণ করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

আহমদ শরীফের 'বিচিত চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'সাহিত্যের রূপকল্পে ও রসকল্পে বিবর্তনের ধারা' প্রবন্ধটিতে মানব সভ্যতার বিকাশ ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে সাহিত্যের রূপ ও রসের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করা হয়েছে। নিচে এর মূল পয়েন্টগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরা হলো:

- **কল্পনা ও রূপকথার যুগ (শৈশবকাল):** আদিম বা বর্বর যুগে মানুষের মনে জাগতিক চাহিদার পাশাপাশি এক অবচেতন মানসিক পিপাসা ছিল। প্রকৃতির অজানা রহস্য ও বিস্ময় থেকে মুক্তি পেতে মানুষ কল্পনা দিয়ে দেব-দেবী, রাক্ষস-খোক্কস ও পরীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করে। এই ভাবনার প্রতিফলন থেকেই জন্ম নেয় রূপকথা।
- **মহাকাব্য ও রোমান্সের যুগ (দ্বিতীয় স্তর):** জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস বাড়ার সাথে সাথে মানুষের মন কিছুটা পরিপক্ব হয়। এ যুগে মানুষের ক্ষমতার মোহ ও ভোগলিপ্সা (যেমন: রাজ্য ও নারী লাভ) তৈরি হয়। ফলে সাহিত্যের মনোরাজ্যে স্বপ্নের সাথে বাস্তব যুক্ত হয় এবং দেব-মানবের দ্বন্দ্ব ও বীরত্বের কাহিনী নিয়ে মহাকাব্য (যেমন: রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড) ও রোমান্সের সৃষ্টি হয়।
- **বাস্তবতা ও গণজীবনের সাহিত্য (তৃতীয় স্তর):** সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে সাহিত্য সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে। আকাশ-কুসুম কল্পনা বাদ দিয়ে মানুষ মাটির পৃথিবীর জীবন-জীবিকা, সুখ-দুঃখ এবং বঞ্চনার কথা প্রকাশ করতে শুরু করে। জাগতিক কাম ও অর্থই মানুষের প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে।
- **আধুনিক যুগ ও গণসাহিত্য:** বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে মহাবিশ্বের রহস্য উন্মোচিত হওয়ায় মানুষের মনের আদিম ভয় ও সংস্কার দূর হয়ে যায়। ধর্ম ও নৈতিকতার পুরনো বিশ্বাস ভেঙে যাওয়ায় সমাজে ধনী-দরিদ্র এবং ভোগী ও বঞ্চিতদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বঞ্চিত ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার, সাম্য, মানবতা এবং শোষকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে জন্ম নেয় গণসাহিত্য।

মূল কথা: সাহিত্য আসলে কোনো যুগেই অলৌকিক বা অবাস্তব ছিল না। মানুষের জীবনবোধ ও মানসিকতা যখন যেমন ছিল, সাহিত্যও তারই প্রতিচ্ছবি হিসেবে সেভাবে রূপ পরিবর্তন করেছে।

আহমদ শরীফের 'বিচিত চিন্তা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাংলা সাহিত্যের ইসলামমুখী ধারা' প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে মূল পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

- **ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও স্নায়ুবিক দ্বন্দ্ব:** ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন ও শাসন প্রতিষ্ঠা সামাজিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। পূর্বে আগত বিভিন্ন জাতি এদেশীয় সমাজের সাথে মিশে গেলেও, নিজস্ব সুদৃঢ় জীবনদর্শন ও সংস্কৃতির কারণে মুসলমানরা আলাদা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। ফলে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ও মুসলিম সমাজের মধ্যে একটি তীব্র মনস্তাত্ত্বিক ও স্নায়ুবিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়—কেউ কাউকে সম্পূর্ণ আত্মস্থ করতে পারেনি।
- **সমন্বয় ও মিলনের প্রয়াস:** এই দূরত্ব ঘোচাতে রামানন্দ, কবির, নানক, শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে সম্রাট আকবর এবং পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত বহু মনীষী ধর্মীয় সমন্বয় ও ঐক্যের চেষ্টা করেছেন। বাউল বা মুর্শিদপন্থীদের গানেও এই মিলনের সুর ছিল। তবে সাধারণ মানুষের গোঁড়ামির কারণে এই উদার প্রচেষ্টাগুলো সামাজিকভাবে সবসময় স্থায়ী বা সফল হতে পারেনি।
- **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ইসলামমুখিনতা:** মধ্যযুগে সমাজের নানা বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে জায়নুদ্দিন, সৈয়দ সুলতান, আবদুল হাকিম প্রমুখ মুসলিম কবিরা একদিকে যেমন রসুল ও ইসলামের মাহাত্ম্য নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন, অন্যদিকে হিন্দু-মুসলিম ধর্মের মৌলিক ঐক্য সন্ধানে তত্ত্ব-সাহিত্য ও রাধাকৃষ্ণের পদাবলীও লিখেছেন।
- **আধুনিক যুগের বিবর্তন:** ইংরেজ আমলে আধুনিক সাহিত্যের বিকাশের সাথে সাথে ইসলামমুখী ধারার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পরিবর্তিত হতে থাকে:
  - মীর মশাররফ হোসেনের লেখায় স্বজাতিনিষ্ঠার পাশাপাশি হিন্দুয়ানি কল্পনার প্রভাব দেখা যায়।
  - প্রথমদিকে রক্ষণশীলতার কারণে হিন্দুদের দ্বারাও কোরআনের বঙ্গানুবাদ ও রসুলের জীবনী রচিত হয়েছিল।

- ○ কবি কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গান ও কবিতাগুলোতে মূলত তীব্র স্বাধীনতা-বাঙ্ছা ও নিপীড়িত মানবতার প্রতি দরদ প্রকাশ পেয়েছে, যা পাঠকদের ইসলামী ঐতিহ্য ও সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ করে।
- ○ পরবর্তীতে গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান এবং তালিম হোসেন প্রমুখের হাত ধরে এই ধারাটি বিকশিত হয়। বিশেষ করে ফররুখ আহমদের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবনের (Revivalism) তীব্র আবেগ দেখা যায়।

- **উপসংহার:** আপাতদৃষ্টিতে বিষয়বস্তুর মিলের কারণে এই সাহিত্যকে একক 'ইসলামমুখী ধারা' মনে হলেও, বিভিন্ন যুগে এর অন্তর্নিহিত প্রেরণা, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল (যেমন—মধ্যযুগে ধর্মানুরাগ, নজরুলের সময়ে সমাজবোধ এবং পরবর্তীতে দেশবিভাগের পটভূমিতে জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রাদর্শ)। বর্তমান যুগে জীবনসংগ্রামের জটিলতার কারণে এই ধারার সাহিত্য সাধক ক্রমশ বিরল হয়ে পড়েছে।

আহমদ শরীফের ‘বিচিত চিন্তা’ গ্রন্থের "সংস্কৃতি চিন্তা" অংশের অন্তর্গত "স্বদেশ, স্বভাষা ও স্বাজাত্য" প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে মূল পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

- **বাঙালি মুসলমানের পরিচয় ও সমন্বয় সাধনা:** বাঙালি মুসলমানরা নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিকভাবে সম্পূর্ণ বাঙালি, তবে ধর্মে আরবের এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে একসময় ইরান ও বর্তমানে ইউরোপীয় সভ্যতার অনুসারী। বিগত হাজার বছর ধরে এই তিন ধারার স্বভাব, আদর্শ ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছে।
- **স্বভাবধর্ম বনাম আদর্শবাদ:** মানুষের স্বভাবধর্ম পরিবেশের সাথে যুক্ত এবং তা অপ্রতিরোধ্য, পক্ষান্তরে আদর্শবাদ হলো বুদ্ধিপ্রসূত ও সাধনাসাপেক্ষ। ফলে হাজার বছরেও এই সমন্বয়-সাধনা পুরোপুরি সফল হয়নি।
- **ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি অবিচলতা:** ধর্মান্তরের ফলে মানুষ ধর্ম বা ঐতিহ্য ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু তার দেশ বা ভাষা বদলায় না। অতীতের বাঙালি মুসলমানরা স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করলেও মাতৃভাষা বাংলাকে কখনো ত্যাগ করেননি।
- **বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান:** মধ্যযুগ থেকেই হিন্দু কবিদের পাশাপাশি শাহ্ মুহম্মদ সগীর, জায়নুদ্দিন, সৈয়দ সুলতান এবং দৌলত উজির বাহরাম খাঁর মতো অসংখ্য মুসলিম কবি ও বহিরাগত অভিজাত ব্যক্তিরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।
- **হীনমন্যতা দূরীকরণের আহ্বান:** ফারসি ভাষার ওপর আরবির প্রভাব রুখে দিয়েছিল ইরান। একইভাবে বাঙালি মুসলমানদেরও নিজেদের ভাষা ও ঐতিহ্য নিয়ে হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলা উচিত এবং বাংলা ভাষাকে নিজেদের মন-মনন ও ইসলামি ভাবাদর্শে সমৃদ্ধ করা উচিত।
- **স্বাজাত্যবোধ ও বিশ্বজনীন কল্যাণ:** স্বাজাত্যবোধ মানুষের আত্মকল্যাণ ও শক্তির উৎস। তবে নিজের কল্যাণের পাশাপাশি সমাজ, দেশ এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বের মঙ্গলের দিকেও নজর রাখা দরকার। লোভ ত্যাগ করে "নিজে বাঁচো এবং অন্যকে বাঁচতে দাও" (Live and let others live)—এই নীতির মাধ্যমেই পৃথিবীতে পরম শান্তি আনা সম্ভব।

আহমদ শরীফের ‘বিচিত চিন্তা’ গ্রন্থের সংস্কৃতি চিন্তা অংশের **'স্বাতন্ত্র'** প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো:

মূল ভাব: লেখক এখানে মানুষের প্রকৃত 'স্বাতন্ত্র্য' বা অনন্যতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, জন্মসূত্রে বা প্রকৃতিগতভাবে যে পার্থক্য তৈরি হয় তা কেবলই 'স্বভাব' বা বৈচিত্র্য মাত্র। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হলো মানুষের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মননশীলতার মাধ্যমে অর্জিত একটি ব্যক্তিক গুণ, যা কখনো সমাজ বা জাতিগত অন্ধ অনুকরণ হতে পারে না।

মূল পয়েন্টসমূহ:

- **স্বাতন্ত্র্য অর্জিত গুণ, স্বভাব নয়:** রূপগত বা প্রাকৃতিকভাবে যে অনৈক্য (যেমন সাপে-মানুষে পার্থক্য), তা মানুষের গৌরব নয়, সেটি সৃষ্টির নিয়ম বা স্বভাব। মানুষের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য একান্তই তার ব্যক্তিগত চর্চা, প্রজ্ঞা ও সচেতন মনন থেকে অর্জিত হয়।
- **যান্ত্রিক অনুকরণ বনাম সত্য উপলব্ধি:** অন্যের উপলব্ধ সত্যকে নিজের মধ্যে ধারণ না করে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে তা প্রাণহীন যান্ত্রিকতায় রূপ নেয়। সচেতন মন ছাড়া সমাজ, ধর্ম, জাতি বা রাষ্ট্রকে যান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করলে তা কল্যাণের বদলে ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
- **হিংসা ও বিদ্বেষকে স্বাতন্ত্র্য ভাবার ভুল:** মানুষ আজ মতানৈক্য, আচারের পার্থক্য এবং সংকীর্ণ সংস্কারকে 'স্বাতন্ত্র্য'

নামে ভুল পরিচয় দিচ্ছে। এই অন্ধ আবেগের কারণে মানুষ নিজের ধর্ম, জাতি বা রাষ্ট্র ছাড়া অন্য সবাইকে শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে, যা মানব সভ্যতার জন্য একটি মর্মান্তিক ব্যর্থতা।

- বাহ্যিক বিজয় বনাম মানসিক দৈন্য: বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষ আজ প্রকৃতির ওপর বিজয় লাভ করলেও নিজের পাশবিক বৃত্তি, ঈর্ষা ও লোভ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। ফলে আজ মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে খোদ মানুষই।
- প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি: প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যবোধ গড়ে ওঠে উচ্চমানের সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদাবোধের ওপর ভিত্তি করে। এর প্রথম পাঠ হলো সহিষ্ণুতা ও উদারতা। একজন প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য সচেতন মানুষ কখনো অন্যের ক্ষতি করে নিজের প্রতিষ্ঠা চায় না, বরং সে নিজে ভালো হয়ে অন্যের ভালো কামনা করে এবং সমাজে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী হয়।

আহমদ শরীফের ‘বিচিত চিন্তা’ গ্রন্থের ‘সংস্কৃতি চিন্তা’ অংশের অন্তর্গত ‘দেশ, জাত ও ধর্ম’ প্রবন্ধটির একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে মূল পয়েন্ট আকারে তুলে ধরা হলো:

- জীবনই মুখ্য, ধর্ম গৌণ: মানুষের জীবন ও তার প্রয়োজনেই ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে, ধর্মের জন্য জীবন নয়। মানুষের জীবন দেশ ও কালের প্রভাবে গড়ে ওঠে।
- ধর্ম ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন: আরব, ইরান, তুরস্ক বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে ধর্মীয় বিশ্বাস সেখানকার দেশীয় ঐতিহ্যবোধের পরিপন্থী নয়। লেখক দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, কেবল আমাদের দেশেই শাসন ও শোষণের সুবিধার্থে দেশ, জাতি ও ধর্মের মধ্যে কৃত্রিম দ্বন্দ্ব তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- বাঙালি ও মুসলমান সত্তার সমন্বয়: আমরা একাধারে বাঙালি এবং মুসলমান। ধর্মীয় অনুশাসন ও আচরণ নিষ্ঠার সাথে পালনের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর, কল্যাণকর এবং জ্ঞানভিত্তিক—তা বিদেশী বা বিজাতির বলে বর্জন না করে গ্রহণ করাই শ্রেয়।
- জাতীয়তাবোধের কৃত্রিমতা: রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাবোধ মূলত কৃত্রিম ও স্বার্থের ওপর নির্ভরশীল, যা স্থায়ী নয়। স্বার্থের সূত্র ছিঁড়ে গেলে এই জাতীয়তাও বিলুপ্ত হয়। যেমন—পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থচেতনা থেকে, কোনো ধর্মীয় প্রীতি থেকে নয়।
- বাঙালিত্ব ও নিজস্ব ঐতিহ্য রক্ষা: আমরা জাতে বাঙালি এবং আমাদের আত্মবিকাশের জন্যই আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্র চেয়েছিলাম, আত্মবিলোপের জন্য নয়। নিজের দেশের ঐতিহ্যকে ধারণ করেই আত্মবিকাশ সম্ভব। তাই পাল রাজাদের গৌরব, সুলতানী আমলের ঐশ্বর্য, মসলিন শিল্প, বৌদ্ধ মূর্তিশিল্প, বাউল দর্শন থেকে শুরু করে চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রসাহিত্য—সবই আমাদের পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকার এবং আমাদের সংস্কৃতির অংশ।
- সংস্কৃতির গতিশীলতা: সংস্কৃতি কোনো বদ্ধ বিষয় নয়, এটি বহতা নদীর মতো গতিশীল। প্রতিনিয়ত সুন্দর ও কল্যাণকে জীবনে গ্রহণ ও সৃজন করার নামই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা বা ‘শুচিবাই’ আসলে সংস্কৃতিবিমুখতারই রূপান্তর। নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে পুরো বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য।

আহমদ শরীফের ‘সংস্কৃতি’ প্রবন্ধের মূল ভাব ও প্রধান পয়েন্টগুলোর একটি সহজ ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো:

- সংস্কৃতির স্বরূপ: 'Culture'-এর কোনো একক বা সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। বাংলা ভাষায় কৃষ্টি, তমদুন, ভদ্রতা, সুরুচি ইত্যাদি প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হলেও এগুলো সংস্কৃতির একেকটি খণ্ডাংশ মাত্র, পূর্ণাঙ্গ রূপ নয়। সংস্কৃতি মূলত একটি পরিস্রুত জীবন-চেতনা।
- ব্যক্তি বনাম সমষ্টি: সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে ব্যক্তিমনে। এটি কোনো সমবায় বা যৌথ সৃষ্টি নয়। কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি যখন নতুন কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করেন, পরবর্তীতে তা অন্যরা অনুসরণ ও অনুশীলন করে। এভাবে তা সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক সময় ‘জাতীয় বা দেশীয় সংস্কৃতি’ হিসেবে পরিচিতি পায়।
- সৌন্দর্য-চেতনা ও সৃজনশীলতা: সংস্কৃতির অপর নাম সৌন্দর্য-অন্বেষা বা সৌন্দর্য-চেতনা। স্থূল প্রয়োজন মেটানোর পর যেখানে প্রয়োজনের শেষ, সেখান থেকেই সংস্কৃতির শুরু। মানুষ তার অবচেতন প্রেরণা বা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকেই নিজের চিন্তা, কর্ম ও ব্যবহারে লাবণ্য সৃষ্টি করে অপরের কাছে নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে চায়।
- সংস্কৃতি ও আচার: মৌলিক সংস্কৃতি সবসময় সৃজনধর্মী ও গতিশীল। এটি কখনো পুরনো হয় না। কিন্তু সংস্কৃতির ভেতরের প্রাণের প্রেরণা ও মানবিক তাৎপর্য যখন হারিয়ে যায়, তখন তা কেবল একটি যান্ত্রিক 'আচার' বা

বিচিত চিন্তা

সংস্কারে পরিণত হয় (যেমন বর্তমানের জাকাত দান প্রথা)।

- সংস্কৃতিবান মানুষের বৈশিষ্ট্য: সংস্কৃতিবান মানুষ কখনো অসুন্দরের সাথে আপোস করে না। আত্মসম্মানবোধ, সহিষ্ণুতা, যুক্তিনিষ্ঠা, উদারতা ও কল্যাণবুদ্ধি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তারা সমাজের সাথে যুক্ত থেকেও নিজেদের ব্যক্তিত্বে অনন্য হন।
- বাঙালি সংস্কৃতি ও গ্রহণশীলতা: সব সমাজে সবসময় নতুন কিছু তৈরি করার মতো পর্যাপ্ত প্রতিভাবান মানুষের আবির্ভাব ঘটে না। তাই সংস্কৃতির ধারা বজায় রাখতে সৃজনশীলতার পাশাপাশি 'গ্রহণশীলতা' বা আত্মস্থ করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। বাঙালিরা মূলত গ্রহণ করেই সংস্কৃতিবান হয়েছে— যেমন আমাদের ধর্ম, ভাষা, প্রশাসনিক ঐতিহ্য এবং আধুনিক জীবনযাপনের নানা উপকরণ উত্তরভারত, আরব কিংবা ইউরোপ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

আহমদ শরীফের ‘সংস্কৃতি চিন্তা’ প্রবন্ধের অন্তর্গত ‘ধর্মবুদ্ধির গোড়ার কথা’ লেখাটির একটি সহজ ও তথ্যপূর্ণ সারসংক্ষেপ নিচে মূল পয়েন্ট আকারে দেওয়া হলো:

- জাদুবিশ্বাস ও আদিম ধর্ম: আদিম মানুষের আদিম অজ্ঞতা ও জীবনধারণের ভয়-বিস্ময় থেকেই কল্পনার জন্ম। জীবনধারণের চরম অভাব ও অতৃপ্তি থেকে বাঁচার জন্য প্রকৃতির অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে মানুষ ‘জাদুবিশ্বাস’ বা তুকতাক-মন্ত্রের আশ্রয় নেয়, যা ছিল মানুষের আদিম ধর্ম।
- ভালো-মন্দ ও সত্যের আপেক্ষিকতা: মানুষের ভালো-মন্দ বা সত্যের ধারণা চিরন্তন নয়, বরং আপেক্ষিক ও স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট। যা জীবনধারণের জন্য অনুকূল বা উপযোগী, তা-ই ভালো এবং সত্য হিসেবে গণ্য হয়েছে।
- জ্ঞান ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব: মানুষের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান ও যুক্তির বিকাশ ঘটে যা সংস্কার ভাঙে। অন্যদিকে, মানুষের আদিম ভীতি ও অক্ষমতা বিশ্বাস বা সংস্কারকে টিকিয়ে রাখে। এই জ্ঞান ও বিশ্বাসের মিশ্রণে সৃষ্টি হয় এক অপার্থিব রহস্যময় 'অধ্যাত্মবুদ্ধি'।
- সমাজ শাসন ও শাস্ত্রের সৃষ্টি: সমাজ ও গোত্রকে সুশৃঙ্খলভাবে শাসনের জন্য জ্ঞানী ও অধ্যাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা ইহলোক-পরলোক, পাপ-পুণ্য এবং অপৌরুষেয় শাস্ত্রের ধারণা তৈরি করেন। এই শাস্ত্র মূলত সবল বা শাসক শ্রেণীর সুবিধার্থে তাদের দ্বারা রচিত হয়েছিল।
- ধর্মীয় কোন্দল ও বিভেদ: একসময়ের সমাজ বা গোত্রীয় আচার-ঐতিহ্য পরবর্তীতে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আজো স্থায়ী কোন্দল, বিদ্বেষ ও বিভেদের দেয়াল তৈরি হয়ে আছে।
- আধুনিক যুগের পরিবর্তন (Ism বা মতবাদ): বিজ্ঞানবুদ্ধির বিকাশ এবং আধুনিক ভোগবাদী জীবনযাত্রার কারণে অলৌকিকতার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও সমাজ-শাস্ত্রের কড়াকড়ি কমেছে। আগে মানুষ ধর্মের মাধ্যমে যেভাবে প্রভাব বা নেতৃত্ব অর্জন করত, বর্তমান যুগে এসে তা বিভিন্ন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক মতবাদ (Ism)-এর মাধ্যমে করছে।
- ধর্মবোধের চিরন্তনতা: মানুষ শুরু থেকেই জাগতিক জীবনকে ভালোবেসেছে এবং তা সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। নিজের অপারগতা, দুঃখের ভয় ও সুখের আকাঙ্ক্ষা থেকেই মানুষ অলৌকিক শক্তির করুণা খোঁজে। মানুষের এই চিরন্তন মানসিক দুর্বলতা ও অসহায়তার কারণেই সমাজে ধর্মবোধের কখনো মৃত্যু ঘটে না।